## বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরিক্রমা

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের একটি সমৃদ্ধ এবং দীর্ঘ ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমা রয়েছে। প্রায় ১০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে নানা চড়াই-উৎরাই এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনকে অগ্রসর হতে হয়েছে। সমবায় শুধু মাত্র একটি উন্নয়ন দর্শনই নয়, এটি আর্থ-সামাজিক আন্দোলনও বটে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে এ আন্দোলন চলমান রয়েছে। মানুষের অংশ গ্রহনের মাধ্যমে সমবেত উদ্যোগের এ আন্দোলনকে যথাযথ সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (International Cooperative Alliance- ICA)। বিশ্বের সকল দেশেই যে সমবায় আন্দোলন অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত হচেছ তা-নয়। ICA এর তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের সফল ৩০০টি সমবায়ের মধ্যে স্বল্পোন্নত কিংবা পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির দেশ সমূহের সমবায় প্রতিষ্ঠান খুব একটা জায়গা করে নিতে পারেনি। এর মানে এই নয় এ দেশগুলোতে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিটি দেশের আর্থ- সামাজিক বাস্তবতা, নীতি-কাঠামো, প্রচলিত সমবায় আইন, নেতৃত্ব, গনমানুষের মানসিকতা ইত্যাদির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাই সমবায় আন্দোলনের সাফল্য-ব্যর্থতার মধ্যেও দৃশ্যমান পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের সাফল্য-ব্যর্থতা মূল্যায়নের জন্য এর ঐতিহাসিক পরিক্রমার সুনিদির্ষ্ঠ মাইল ফলকগুলো জানা আবশ্যক। নিম্নে সন অনুযায়ী সংক্ষিপ্তভাবে বাংলাদেশের সমবায়ের ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্ঠা করা হয়েছে ঃ-

১৯০৪- কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ এ্যাক্ট প্রনীত হয়।

১৮৭৫সালে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এই বিদ্রোহের মূলে ছিল কৃষি ঋণের অভাব, মহাজনী ঋনের চক্রবৃদ্ধিজনিত উচ্চ সুদের হার, কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য। এ প্রেক্ষিতে ১৯০১ সালে ইন্ডিয়ান ফেমিন কমিশনের সুপারিশ মতে এবং তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন কর্তৃক গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ঠ (লর্ড এডওয়ার্ড ‘ল’, স্যার নিকলসন ও ডুপার নিক্স) কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯০৪ সালে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ এ্যাক্ট প্রনীত হয়।

১৯১২- কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট জারী করা হয়।

১৯০৪ সালে প্রণীত কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ এ্যাক্ট এর আওতায় কেন্দ্রীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে সমবায় সমিতি গঠনের সুযোগ না থাকায় দ্বি-স্তর এবং ত্রি-স্তর বিশিষ্ঠ সমবায় সমিতি গঠনের লক্ষ্যে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ এ্যাক্ট এর পরিবর্তে কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট জারী করা হয়।

১৯১৪- ম্যাকলেগান কমিটি গঠন।

ভারতবর্ষের কো-অপারেটিভগুলোর সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য ১৯১৪ সালে স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলেগানকে প্রধান করে "ইমপেরিয়াল কমিটি অন কো- অপারেটিভ ইন ইন্ডিয়া" গঠিত হয়। ১৯১৫ সালে ম্যাকলেগান কমিটি সুপারিশ দাখিল করে। এই কমিটির প্রতিবেদনকে ভারতের জন্য "সমবায়ের বাইবেল" হিসেবে আক্ষা দেয়া হয়।

১৯১৯- সমবায়কে ভারতবর্ষে প্রাদেশিক বিষয় হিসেবে রুপান্তর করা হয়। প্রাদেশিক বিষয় হিসেবে রুপান্তরের ফলে বিকেন্দ্রীকরনের আওতায় বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার তাদের প্রদেশের জনগনের চাহিদা অনুযায়ী সমবায় আইন ও নিয়মাবলী প্রণয়ন করে।

১৯৪০ -বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট প্রণয়ন।

সমবায়কে প্রাদেশিক বিষয় হিসেবে ঘোষনার পর বঙ্গদেশে বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়। এই আইন সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালনার বিষয়ে পরিপূর্ন আইন হওয়ায় ১৯৮৪সালের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত আইনের মাধ্যমেই বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন অগ্রসর হয়।

১৯৪২ - সমবায় নিয়মাবলী জারী।

এটিই এই অঞ্চলে প্রণীতি প্রথম সমবায় নিয়মাবলী। মূলত বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট ১৯৪০ এর সমর্থনে ১৯৪২সালে সমবায় নিয়মাবলী জারী করা হয়।

১৯৫৬- কুমিল্লার কোটবাড়ীতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী স্থাপিত হয়।

ডঃ আখতার হামিদ খান সমবায় সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী উন্নয়ণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। (এটি বর্তমানে বাংলাদেশ একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঅজউ হিসেবে পরিচিত।)

১৯৫৮- পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক এ অঞ্চলের সমবায়গুলোকে কৃষি ঋণ দেয়া শুরু করে।

১৯৫৯ - ডঃ আখতার হামিদ খান উদ্ভাবিত দ্বি-স্তর ভিত্তিক সমবায় কাঠামো "কুমিল্লা পদ্ধতি" এর পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু।

১৯৬০- সমবায় অধিদপ্তর হতে মাসিক 'সমবায়' এবং ইংরেজী সান্মাসিক "কো-অপারেশন" পত্রিকাদ্বয়ের প্রকাশনা শুরু হয়। ১৯৬০ সালে ঢাকার গ্রীন রোডে বাংলাদেশ সমবায় কলেজ স্থাপিত হয়।

১৯৬১- বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ইউনিয়ন) আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থার (ওঈঅ) সদস্য ভূক্ত হয়।

১৯৬২ - প্রথমবারের মত "জাতীয় সমবায় নীতিমালা" গৃহীত ও প্রচারিত হয়। ১৯৬২ সালে বাংলাদেশ সমবায় কলেজ গ্রীন রোড হতে কুমিল্লার কোটবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৭২- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে "সমবায়"কে সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে একটি পৃথক (২য়) খাত হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

১৯৭২-৭৩ উক্ত অর্থ বছরে কুমিল্লা দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির সম্প্রসারন কল্পে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (ওজডঁচ) দেশের বিভিন্ন থানায় বাস্তবায়ন শুরু করা হয়।

১৯৭৩- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দুগ্ধ চাহিদা পূরণের জন্য সমবায়ের ভিত্তিতে দুগ্ধ উৎপাদন,প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপননের লক্ষ্যে মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৮২- সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (ইজউচ) নামে রূপান্তর করা হয়।

১৯৮৪- বাংলাদেশে ১ম বারের মত সমবায় অধ্যাদেশ জারী করা হয়। ১৯৪০সালের সমবায় আইনকে যুগোপযোগী করে সামরিক সরকার কর্তৃক সমবায় অধ্যাদেশ জারী করা হয়।

১৯৮৭- সমবায় অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর সমর্থনে সমবায় নিয়মাবলী প্রবর্তন করা হয়।

১৯৮৯- স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মত সমবায় নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়।

২০০১- প্রথমবারের মত বাংলায় সমবায় আইন জারী করা হয়।

২০০২- সমবায় আইন ২০০১ এর কতিপয় ধারা সংশোধন করে সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০০২ জারী করা হয়।

২০০৪- সমবায় আইন ২০০১ এবং সংশোধিত আইন ২০০২ এর সমর্থনে ২০০৪ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ জারী করা হয়।

২০১২- দারিদ্র্যমুক্ত আত্ম-নির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ায় সমবায়ী উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান এবং গণমুখী সমবায় আন্দোলনের দিকনির্দেশনার প্রয়োজনে ১৯৮৯ সালে প্রণীত সমবায়নীতিকে যুগোপযোগী করে "জাতীয় সমবায় নীতি ২০১২" প্রণয়ন করা হয়।

২০১৩- সমবায় আইন ২০০১ কে অধিকতর সংশোধন করে সংশোধিত সমবায় আইন ২০১৩ জারী করা হয়।

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হ'ল-

(ক) এ অঞ্চলে সমবায় নিয়ে নানা ধরনের অতিমাত্রায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, ফলে সমবায় আইন ও বিধি সুস্থিতি পায় নি।

(খ) সমবায় আন্দোলনকে বাস্তবায়নের জন্য সমান্তরাল একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরী করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কাজ করতে গিয়ে সাধারণ সমবায়ীরা বিভ্রান্ত হয়েছে।

(গ) সমবায় সাফল্যের অন্যতম হাতিয়ার হ'ল "প্রশিক্ষণ"। কিন্তু তৃণমূলের সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য সু-সংগঠিত প্রশিক্ষণ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ ছিল সীমিত।

(ঘ) সমবায় আইন ও বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক সমস্যা সমাধানকে প্রাধ্যন্য দেয়া হলেও দীর্ঘ মেয়াদে সমবায় আন্দোলনকে ধারাবাহিক সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছানোর বিষটি কিছুটা উপেক্ষিত হয়েছে।

(ঙ) পল্লী উন্নয়ন নিয়ে গবেষণার জন্য স্বতন্ত্র দুটি জাতীয় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান থাকলেও এদের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনের প্রায়োগিক গবেষনার কাজ খুব একটা হয় নি। অন্য দিকে সমবায়কে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গবেষনা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও এখনও এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে নি।

(চ) সমবায়কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে মালিকানার ২য় খাত হিসেবে স্থান দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন সেক্টরাল (খাত) নীতিমালায় (যেমন শিল্পনীতি, কৃষিনীতি, শ্রমনীতি ইত্যাদি) সমবায়কে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে অর্ন্তভূক্ত করার বিষয়টি দৃশ্যমান হয়নি।

(ছ) সমবায়কে বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করতে হয় কিন্তু সমবায় আইন ও বিধি সেক্টরাল ভিত্তিক না হওয়ায় নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। সেক্টর ভিত্তিক সমবায় আইন ও বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে অনেক দেশ দ্রুত সাফল্য পেয়েছে। এ বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

গ্রন্থনায়

মোঃ মাহবুবুর রহমান

উপ-প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-নিবন্ধক)

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প

সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।